পোশাক ও পোশাকের রাজনীতি

চিররঞ্জন সরকার

পোশাক নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার আগে মনে আসে পারস্যের কবি শেখ সাদিকে নিয়ে প্রচলিত সেই গল্পটি। একবার রাজদরবারে যাওয়ার পথে এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেন কবি শেখ সাদি। সাধারণ পোশাকে থাকায় কবিকে চিনতে না পেরে তেমন আপ্যায়ন করেন নি বাড়ির মালিক। রাজদরবার থেকে অনেক উপহার নিয়ে ও দামি পোশাক পরে ফেরার পথে কবি আবারো ওই বাড়িতে হাজির হন। এবার বাড়ির মালিক তাকে চিনতে পেরে বাড়তি আপ্যায়ন করেন। কিন্তু কবিকে মর্যাদা না দিয়ে পোশাককে গুরুত্ব দেওয়ায় খাবার কবি তার জামার পকেটে ভরতে থাকেন।

এমন গল্প বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে নিয়েও আছে। পোশাক নিয়ে আমাদের সমাজে রয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তবে ইদানীং পোশাক নিয়ে 'আগ্রাসী' তৎপরতা বাড়ছে। পোশাক হয়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বাধীনতা দমনের হাতিয়ার। শ্লীলতা-অশ্লীলতা নির্ণয় ও ধর্মপ্রতিষ্ঠারও অনুষঙ্গ। পোশাককে ঘিরে সমাজে বিভেদ, বিতর্ক ও রাজনীতি বাড়ছে।

আসলে পোশাকের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতির অভিব্যক্তি, চিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। পোশাক থেকে একটি জাতির আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হতে পারে। পোশাক সমাজ-সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য রূপ, কারণ এটি সমাজে বিদ্যমান অভ্যাস, রীতিনীতি, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মূল্যবোধ, পরিবার, পরিবেশ, মিডিয়া, ফ্যাশনপ্রবণতা এবং ব্যক্তিগত চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক টুকরা পোশাক একজন মানুষের সামাজিক জীবন, আদর্শ, ইতিহাস, শ্রেণি, সম্প্রদায় এবং পরিচয়ের কাঠামোও বর্ণনা করতে পারে।

পৃথিবীতে পোশাকের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষ সম্ভবত প্রথম ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক ব্যবহার শুরু করেছিল। এর কারণ হতে পারে, ঝোপঝাড়ে ফলমূল সংগ্রহকারী মানুষের শরীরকে কাঁটার আঘাত থেকে রক্ষা করা ও শীতে উষ্ণতা পাওয়া। এরপর মানুষ যতই চিন্তা-ভাবনায় ও মনে-মননে বিকশিত হতে শুরু করেছে, শাসন ও নিয়মনীতি চালু করেছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে পোশাকের বৈচিত্র্য ও পোশাকের রাজনীতি।

পোশাকের মর্যাদা তৈরি হয় ব্যবহারকারীদের সংখ্যা, পরিচয়বোধ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যারা এই পোশাক পরছে, তাদের জাতীয় অবদান বিবেচনায় অনেক ক্ষেত্রে মর্যাদার বিচার করা হয়ে থাকে। বহু জাতিগোষ্ঠীর এই দেশে পোশাকের যে বৈচিত্র্য থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। হয়ত সে কারণেই আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারিত কোনো জাতীয় পোশাক নেই।

মানুষের পোশাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে তার ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। ধর্মীয় বোধও এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এর বাইরে আরেকটি কারণ হচ্ছে ঔপনিবেশিক প্রভাব। এদের ঘিরে তৈরি হচ্ছে পোশাকের রাজনীতি। ভারতবর্ষ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে গেছে, যার প্রভাব পোশাকেও পড়েছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে কোম্পানির সাহেব-কর্মচারীরা 'শাড়ি' নামক পোশাকটি ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ব্যাপক ব্যবহার করতে শুরু করেন অষ্টাদশ শতক থেকে। কোম্পানি আমলের ছবিতেও ক্রমশ সাধারণ পরিধেয় আর বিশেষ উপলক্ষের পোশাকের ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে। অনেক সময় জাতি, শ্রেণি, ধর্ম ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে পুরুষ-নারীর জুটির ছবি আঁকা হতো নৃতাত্ত্বিক নমুনা হিসেবে। এই ছবিগুলো প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে ভারতীয়দের পোশাক দিয়ে কেমন করে চিনে নিতে হবে, তার নথি তৈরি করা শুরু হলো। ভারতের মানুষ যেন একটিমাত্র কালখণ্ডের মধ্যে তার পোশাকের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে গেল, যার আর লয়-ক্ষয় নেই। এরই মধ্যে নারীদেহের 'আব্রু' রক্ষার ব্যাপারে খ্রিষ্টান পাদরিরাও নিজেদের প্রভাব খাটাতে শুরু করলেন। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভিক্টোরীয় মানসিকতার প্রবেশ শুরু হলো।

প্রসঙ্গত, ত্রিবাঙ্কুরে ১৮১২-'১৩ সালে দলিত নারীদের বক্ষ-আবরণী ব্যবহার করার আইনি অনুমতি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, যা দাঙ্গা পর্যন্ত ঘটিয়েছিল। 'নিচু জাত'-এর নারীদের সেই আবরণী ব্যবহার করার নিয়ম ছিল না। উচ্চ এবং মধ্যম 'জাত'-এর নারীদের প্রকাশ্যে বেরোনোর জন্য দেহ আবৃত করার যে অধিকার ছিল, তা অর্জন করতে দলিত শ্রেণির মেয়েদের বহু লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল। রবার্ট হার্ডগ্রেভ এই 'ব্রেস্ট ক্লথ' বিতর্ক, তার আইনি এবং সামাজিক ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজশক্তি, সেখানকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট, ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্তম্ভস্বরূপ নেতৃবৃন্দ এবং খ্রিষ্টান পাদরিরা এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যেও মতবিরোধ কম হয় নি। বোঝা যায়, নারীপোশাকের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়মাবলিতে জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম কতভাবে নির্ধারকের ভূমিকা নিয়েছে। নারীরা দেহের কোন অংশ আবৃত করে প্রকাশ্যে বেরোবেন, কীভাবেই বা শালীনতা এবং জাতিভেদের সীমানা নির্ধারিত হবে, তা নিয়ে পিতৃতন্ত্রের নানা শাখার মধ্যে মতভেদ ঘটেছে।

ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে ইউরোপীয় পোশাক সংরক্ষিত করায় পোশাকের রাজনীতি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। এর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলন কিংবা সুভাষ বসুর বিশেষ পোশাক পরা একই সুতোয় বাঁধা। পাকিস্তান আমলে চাপিয়ে দেওয়ার এ চর্চা ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ পড়েছে বৈশ্বিক বাণিজ্যিকীকরণ, প্রভাব বিস্তারকারীদের ধর্মবোধ ও দেশীয় এলিটদের চর্চার ভেতর। ফলে আগের তুলনায় এ লড়াই অনেক বেশি জটিল ও কুটিল হয়েছে।

পোশাক নিয়ে বিতর্ক ও রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত আছে। কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা যাক :

তখন সদ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছে। পুরোনো জমিদারদের জমিদারিতে থাকার বিধান পুরোনো হয়ে যায়। গ্রাম-পরগনা ছেড়ে দলে দলে জমিদার-ভূস্বামী ও সচ্ছল-অর্থবানরা কলকাতায় যাচ্ছেন। একে একে জমিদারদের প্রাসাদ গড়ে উঠছে আলোকোজ্জ্বল ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে। কলকাতার নব্য ভদ্রলোকরা ততদিনে 'ছোটলোক'দের টাইট দিতে শিখে গেছেন। তারা দেশের তাঁতিদের বোনা পাতলা কাপড়কে অশ্লীল, অশালীন আখ্যায়িত করলেন। এই সূক্ষ্ম কাপড়ে নাকি আব্রু রক্ষা হয় না। সূক্ষ্ম কাপড় তৈরিতে বাংলার তাঁতিদের চরমতম দক্ষতা ছিল, তারা ব্রিটিশদের সুতি পরা শিখিয়েছিল। যে কাপড় পাল-সেন-সুলতান-মোগল-নবাবি আমলে শাসকদের গর্বের ছিল, অশ্লীল অভিধার বদলে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, নব্য অভিজাতরা অশ্লীলতা রোধে জমিদারদের চাপ দিলেন সেই সূক্ষ্ম কাপড় উৎপাদন বন্ধের জন্য। প্রভুদের তৈরি ম্যানচেস্টারের মিলের মোটা কাপড়ের আর সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান' বইয়ে সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই লিখেছেন।

পোশাক বিশ্বজুড়ে রাজনীতির প্রতীক ছিল এবং এখনো আছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণও ছিল রাজনীতিই। ভারতে মুঘল সম্রাটরা কাউকে বিশেষ সম্মান দেখাতে চাদর পরিয়ে দিতেন। এখনো উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়। নতুন ক্ষমতাসীনকেও পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়। সেটা সম্রাট, রাজা কিংবা জমিদার সবার বেলাতেই। বার্নার্ড এস কোহনের 'সাম্রাজ্যের মন ও মান' (অনুবাদ : বিশ্বেন্দু নন্দ, ডাকঘর) গ্রন্থে এফ ডব্লিউ বাকলার বলছেন, এই সাম্মানিক বস্ত্র আদতে ক্ষমতার ধারাবাহিকতা ও প্রবহমানতার চিহ্ন। এই চিহ্ন শরীরকেন্দ্রিক, যা ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনের মধ্যে চুক্তির ভূমিকা পালন করে।

যারা ক্ষমতার অংশ বা নতুন ক্ষমতা নির্মাণ করতে চান, তাদের পোশাকও ক্ষমতার অংশে পরিণত হয়। মহাত্মা গান্ধীর ধুতি-চটি, মাওলানা ভাসানীর লুঙ্গি-বেতের টুপি আর বঙ্গবন্ধুর মুজিব কোট এই ক্ষমতার অংশ ছিল। এই ক্ষমতা এক দেহ থেকে আরেক মানবদেহে চড়িয়ে দেওয়া যায়। আর সেই মানবদেহকে ক্ষমতার সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন অনুসারী তৈরি হয়।

দুই.

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানীর পল্টন এলাকার একটি মাঠে ছেলের সঙ্গে এক মায়ের ক্রিকেট খেলার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। কিন্তু মা আর সন্তানের খেলার ওই মুহূর্তটিকে ছাপিয়ে আলোচনা শুরু হয় ওই নারীর পোশাক নিয়ে। বোরকা পরা ওই নারীর পক্ষে যেমন অনেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, অনেকে আবার একে 'পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তানের ছবি' বলেও কটাক্ষ করেছেন।

আসলে নারীর সমাজনির্মিত একটি চেহারা আছে এবং সেই চেহারাটা হিন্দুদের জন্য একরকম, ধর্মনিরপেক্ষদের জন্য একরকম, নারীবাদীদের জন্য একরকম, মুসলমানদের জন্য একরকম, খ্রিষ্টান-বৌদ্ধদের জন্য আরেক রকম। এক শ্রেণির মানুষ এই বিষয়গুলোকে হাতিয়ার করে সামাজিক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। নানা কুতর্কে বিভেদের রেখাটাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাই তো কিছুদিন পর পর নারীর পোশাক নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে। যে যার মতাদর্শ ও বুঝমতো নারী কোন পোশাক পরবে, আর কোনটা পরবে না সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তাতে সমাজ মনস্তত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটে।

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পোশাকও বিবর্তিত হয়েছে। আবার শিক্ষা, ধর্মীয় রীতিনীতির চর্চা, নগরায়ণও পোশাকের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এক সময় অল্প কিছু চাকরিজীবী ছাড়া অন্য পুরুষরা লুঙ্গি পরতেন। এখন কৃষকসহ শ্রমজীবী শ্রেণি ছাড়া অন্যরা ঘরের বাইরে খুব একটা লুঙ্গি পরেন না। শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে প্যান্ট, ট্রাউজার, শর্টস পরার প্রবণতা বাড়ছে। মেয়েরা শাড়ি বাদ দিয়ে সালোয়ার-কামিজ পরছেন। এক সময় হিন্দু নারীরা বিশাল ঘোমটা টেনে কাপড় পরতেন। কালের বিবর্তনে ঘোমটা ছোট হয়েছে কিংবা উঠে গেছে। পাশাপাশি সমাজে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় ধ্যানধারণা বৃদ্ধির কারণে বোরকা পরার প্রচলন বেড়েছে। এটা কূটতর্কের বিষয় নয়, এটা একটা প্রবণতা ও বাস্তবতা। এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের যোগ আছে। সমাজ মনস্তত্ত্ব অস্বীকার করে বোরকার বিরুদ্ধে গর্জন করলেই যেমন এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমবে না, আবার বোরকার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালালেও সবাই বোরকা পরবে না। আমাদের সমাজটা নানা ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ-রুচির মানুষ নিয়ে গঠিত। সেখানে চিন্তা-ভাবনা, আচরণ, পোশাক ইত্যাদিতে ভিন্নতা থাকবেই। কোনো সমাজে সবাই একইরকম পোশাক পরবে, একই ধরনের চিন্তা ও আচরণ করবে এটা অলীক কল্পনা মাত্র। ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে মান্যতা দিতেই হবে। এটা অনিবার্য। সবাইকে এক ছকে সাজানো যাবে না।

কে কোন পোশাক পরবে, সেটা তার ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। যদিও পোশাকের সঙ্গে পারিবারিক রীতি, ধর্মীয় বিধান, ভৌগোলিক ঐতিহ্য, চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য, কাজের প্রকৃতি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, লিঙ্গ-রাজনীতিসহ অনেক কিছুর ভূমিকা রয়েছে। পোশাককে শুধু ধর্মীয় বিধানের আলোকে দেখলেও হবে না। আবার কেবল পছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নান্দনিকতার মাপকাঠিতে দেখলেও হবে না। পোশাককে জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা, ঐতিহ্য ইত্যাদির নিরিখেও দেখার অবকাশ আছে। মেয়েদের পোশাক নিয়ে একটা সূক্ষ্ম রাজনীতি রয়েছে। সেটা পুরুষের বা পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতি। মেয়েদের পোশাক ও অভ্যাস চিরাচরিত সামাজিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। গবেষণা বলছে, মেয়েদের যে পোশাক সমাজ মানসিকতার বিরুদ্ধাচরণ করে তা পুরুষদের ক্রোধ উৎপাদন করে। মেয়েদের কোন পোশাকে দেখতে ঠিক কেমন লাগবে তার জনমত নির্ধারিত একটা গ্রাফ আছে। রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্ব অর্জন করতে হলে প্রথমেই মেয়েদের সেই পুরুষ নির্ধারিত-বৃত্তে বন্দি হতে হয়। মেয়েদের

যোগ্যতা নয়, সামাজিক কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যেই তাদের সনাতন 'ভালো মেয়ে'র স্বীকৃতি লুকিয়ে থাকে। সমাজের কাছে একমাত্র সেই নারীই গ্রহণযোগ্য ও 'কল্যাণকর', যিনি পোশাকে 'শালীন', আচরণে বিনয়ী এবং নিশ্চিতভাবে ঘরোয়া। পোশাক কখনো মেয়েদের ভালো-মন্দের দলিল নয়। অহংকার, ঔদ্ধত্য বা নম্রতার সঙ্গেও যুক্ত নয়। পোশাকের সঙ্গে মেয়েদের স্বকীয়তা, আত্মমর্যাদা বা প্রদর্শনেরও কোনো সম্পর্ক নেই। আছে পছন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের সাযুজ্য।

নারীর পোশাক নিয়ে সমালোচনা করাটা একটা সামাজিক অসুখ। সমাজনির্মিত যে কাম্য ও স্বীকৃত নারীত্ব, এই লিঙ্গ-নির্মাণের অনেকগুলো বিধিনিষেধের একটি প্রধান সেক্টর মেয়েদের পোশাক। পোশাকের ক্ষেত্রে 'চয়েস' বা ইচ্ছেকেই অনেকে প্রধান বিবেচ্য বলে মনে করেন। যদিও প্রশ্ন থেকে যায়, মেয়েরা যা পরেন, যেভাবে পরেন, তা কি তাদের নিজস্ব রুচি-পছন্দ অনুসারেই? নাকি তাদের বেলায় পোশাক মানে সত্যিই পররুচির খেলা? নারীর কাছে 'পররুচি'-র অর্থ আসলে পুরুষের রুচি, যার ভিত্তিতে তাদের পোশাক নির্ধারিত হয়ে থাকে। পোশাকের স্বাধীনতা বা স্বাচ্ছন্দ্যের নামে মেয়েরা যা পরেন, পরতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, আজও তা সুকৌশলে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজই নির্ধারণ করে দেয়। পশ্চিম হোক বা পূর্ব, ভোগবাদ হোক বা রক্ষণশীলতা, বোরকা হোক বা মিনি স্কার্ট পুরুষচক্ষুই আজও নিয়ন্ত্রণ করে নারীর পোশাকের স্বাধীনতা।

পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজ-সংসারের একটা ছক এঁকে দিয়েছে। একেই আমরা কখনো প্রাকৃতিক, কখনো ধর্মীয় বিধান হিসেবে মেনে নিয়েছি। এর বাইরে জগৎ হতে পারে, হওয়া সম্ভব এটা ভাবতে সমাজ, সমাজের প্রথাবদ্ধ মানুষেরা নারাজ। এই বিশ্বাস ভাঙতে গেলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ' নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। জীবনযাপনের অনেক পথ আছে। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা এর কয়েকটাকে বড়ো করে দেখিয়েছে, বিশেষ মাহাত্ম্য দিয়েছে গায়ের জোরে। নারী এই, পুরুষ এই, এরকমই তাদের হতে হবে, এমন পোশাক পরতে হবে, এভাবে চলতে হবে, এভাবে যৌনতার চর্চা করতে হবে, এটা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণা আমাদের মধ্যে এই 'মূল্যবোধ' দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিয়েছে।

কিন্তু এমন যুক্তিও প্রবল যে, বহুজনকে নিয়েই সমাজ। সমাজের প্রত্যেকে যেন নিজের মতো বাঁচতে পারে, নিজের পছন্দ অনুযায়ী চলতে পারে, বলতে পারে, পরতে পারে, সেটাই আজকের যুগের সমাজের এবং মানবাধিকারের মূল কথা। যা কিছু চলে আসছে ধর্ম কিংবা সামাজিক নিয়ম হিসেবে, যা আমরা বাইরে থেকে দেখে অভ্যস্ত, এই 'বাইরের ঠিক' সব সময় ঠিক নয়। ভেতরের বা সত্তার বিকাশই আসল কথা। সত্তাকে উপলব্ধি করতে হয়, তবে তাকে চিনতে পারা যায়। আমাদের সমাজে প্রচলিত ধর্মতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক খাঁচায় সবাইকে 'ফিট' করতে চাওয়া হয়। কেউ ফিট না করলে তাকে বাধ্য করা হয়। যে ফিট করছে না তাকে তার মতো থাকতে দেওয়াটাই যে মানবাধিকারের মূলকথা, এটা সামাজিক মানুষেরা, এমনকি রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রায়শই ভুলে যায়।

ব্যক্তির ছোট ছোট স্বাধীন চেতনা, ইচ্ছে কিংবা অনিচ্ছেগুলোর ওপর প্রায়শই আমরা স্বৈরতন্ত্রী হামলা চালাই। সমাজের উপরিতলের, কিংবা সংখ্যাগুরুর (শুধু ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়) ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশের এক বিরাট অংশের মানুষের স্বাধীনতা। গ্রাম থেকে পড়তে আসা ছেলেটির কথাবার্তায় 'মাদার টাং ইনফ্লুয়েন্স' আছে? ব্যস, তার 'স্বাধীনতা'র বারোটা বাজল। কোনো এক শৈলশহর থেকে মঙ্গোলয়েড শোণিত শরীরে বহন করে রাজধানী শহরে বড়ো সংস্থায় চাকরি করতে এল কোনো তরুণী, তার স্বাধীনতা শেষ হলো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও 'আমাদের মতো' নন যারা, তাদের স্বাধীনতা পাওয়া আজকাল মুশকিল। এইভাবেই ছোট হতে থাকে বৃত্তটা। ছোট হতে হতে এক সময় নিশ্চয়ই বিন্দুতে গিয়ে শেষ হবে স্বাধীনতা বস্তুটা। আসলে, নিজের মতো পোশাক পরার স্বাধীনতা, নিজের ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা, চিন্তা করার স্বাধীনতা, গান গাওয়ার স্বাধীনতা, স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা এ সবকিছু যত দুর্মূল্য হবে, ততই একমাত্রিক হয়ে যাব আমরা। যতই আমরা ভুলে যাব সবাই মিলে বাঁচার নিয়ম, ততই আসলে আলাদা আলাদাভাবে স্বাধীনতা হারাতে থাকব আমরা। এ এক আশ্চর্য ধাঁধা!

পরের রুচিতে চলতে, পরতে, পড়তে, বলতে গিয়ে আমরা ক্রমশই সবার মতো হওয়ার ভান করতে থাকি। ভান করতে করতে সব মুখই মুখোশ হয়ে যায়। শহর-গ্রাম, নগর-মফস্বল সব কেমন একইরকম হয়ে ওঠে বা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রেরও খুব বেশিরকম সুবিধে হয় তাতে। উন্নয়নের সূচক নির্ধারিত হয় মাপা পণ্যে। মানুষকে আর মানুষ ভাবতে হয় না, মুখোশ পরা মানুষকে মুখোশের পরিচয়ে চিনলেই কাজ চলে যায়!

তিন.

ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, ভারতের কর্ণাটকে হিজাব নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে। অনেক দেশে হিজাবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এটা 'পোশাকের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি অধিকারের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ' বলে অনেকে তার প্রতিবাদও করেছেন। বাংলাদেশেও ইদানীং অপছন্দের পোশাক-পরা মেয়েদের ওপর রীতিমতো আক্রমণ শুরু হয়েছে। গত ১৮ মে ২০২২, পোশাকের কারণে এক নারীকে নরসিংদীতে রেল স্টেশনে হয়রানি ও হামলার শিকার হতে হয়।

গত ৯ জুন ২০২২ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রিকশায় চলন্ত অবস্থায় এক কিশোরীর পরনের জামা ছিঁড়ে দিয়েছে মোটর সাইকেল আরোহী এক যুবক। ওই যুবকটি কিশোরীর জামা ছিঁড়ে দিয়ে এমন পোশাক পরার কারণে তাকেই আবার অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করেছে।

আমাদের দেশে একদিকে যেমন ধর্মীয় রাজনীতি বিস্তৃত হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ধর্মীয় উগ্রবাদ, ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি জোর করে চাপিয়ে দেবার প্রবণতা। পুরো সমাজে 'ধর্মীয়করণের' একটা নীরব কিন্তু জোর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নারীরা হয়ে উঠছে এর প্রধান শিকার ও

বাহন। তাদের ‘ধর্মীয় কারণ’ দেখিয়ে হিজাব পরতে বলা হচ্ছে। হিজাব গত কয়েক বছরে আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়েছে। ধর্ম, পর্দা, নিরাপত্তা, ফ্যাশন, ইসলামিক মূল্যবোধের ভিন্ন ব্যাখ্যা, মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির প্রভাব, অর্থনৈতিক-সামাজিক চাপ ইত্যাদি নানা কারণে সমাজে হিজাব পরা মানুষের সংখ্য বাড়ছে।

আমাদের সমাজে মধ্যপ্রাচ্য-ফেরত মানুষের হাত ধরে ও বৈশ্বিক ‘জিহাদী ইসলাম’-এর প্রভাবে হিজাব বাড়ছে। হিজাব নিয়ে এক ধরনের আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। হিজাব না পরাকে এখানে ‘অপরাধ’ বা ‘বেহায়াপনা’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই মনোভাব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এখন এই মতবাদে প্রবলভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। হিজাবিদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হচ্ছেন হিজাব না পরা মেয়েরা।

প্রশ্ন হলো, কেন হিজাব আমাদের দেশে এমন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে? হিজাব কি রাজনীতি প্রভাবিত কোনো পছন্দ? নাকি এটা নারীর ওপর কোনো মহল থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? হিজাব কি মেয়েরা নিজেদের সিদ্ধান্তে পরছে, নাকি সমাজ এবং পরিবার তাদের বাধ্য করছে? ধর্মীয় বাধ্য-বাধকতার অংশ হিসেবে কি মেয়েরা হিজাব পরছে, নাকি এর পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে? হিজাবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কি অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে ভিন্ন হচ্ছে? হিজাব কি আসলেই নারীকে স্বাধীনতা দেয়, নাকি বেশি কাপড়ের আবডালে এটা নারীকে আরো বেশি পরাধীন করে? নাকি হিজাব বিস্তারের ক্ষেত্রে গভীর কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে?

এসব প্রশ্নের তেমন কোনো সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে পোশাক নিয়ে বাড়াবাড়ির পেছনে পুরষতান্ত্রিক রাজনীতিই যে প্রধান ভূমিকা পালন করছে, তা বলাই বাহুল্য। কারণ এখনো পুরুষশাসিত সমাজ ঠিক করে দেয়, নারী কী পোশাক পরবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে পোশাক ও সাজসজ্জার বেড়াজালে নারীকে বেঁধে ফেলার নিরন্তর চেষ্টা চলছে। আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতা দখলের পর সেখানে নারীর পোশাক নিয়ে ফতোয়া শোনা গিয়েছিল। এরপর ভারতের একটি রাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব-পরিহিতা এক ছাত্রীকে নিয়ে বিতর্ক হলো এবং তারপর আমরা দেখলাম বাংলাদেশের এক কলেজ শিক্ষক নারীর টিপ পরার প্রতিবাদে পুলিশের ওসিগিরি। এরপর নরসিংদীতে একজন নারীর নেতৃত্বে জিন্স এবং টপস পরার প্রতিবাদে এক কিশোরীকে হেনস্তা করা হলো। যদিও এসব ঘটনার প্রতিবাদে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে রাজপথ, সর্বত্র আন্দোলন হয়েছে, তবু প্রশ্ন একটাই– নারীর পোশাক নির্ধারণের দায়িত্ব পুরুষকে কে দিয়েছে? এই বিধিনিষেধে ধর্ম বা প্রশাসনকেই কেন যুক্ত করা হয়? এর সবই কি নিছক রাজনীতির স্বার্থে, নাকি নারীকে আজও গৃহবন্দি করে রাখার জন্য এই চেষ্টা? একুশ শতকেও উদারবাদী চিন্তাধারা, নারী স্বাধীনতার আদর্শ, ধর্ম ও সমাজের কাছে যেন পরাজিত!

উপসংহার

মধ্যযুগে নারীকে দমিয়ে রাখতে এবং পরে মুসলিম নারীদের একটা পরিচিতি হিসেবে হিজাব এবং বোরকার বিস্তার ঘটে। নারীকে কোনোকালেই কেউ এই স্বাধীনতা দেয় নি হিজাব বেছে নেবার বা বর্জন করবার। এক সময় একদল পুরুষ এসে বলেছে এটা ভালো, আরেক দল বলেছে খারাপ। কিন্তু সত্যিকারার্থে নারীদের কি মতামত সেটা কেউ কখনো জানতে চায় নি।

সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে কোন পোশাকে তা করা যেতে পারে বা কোন বিদ্রোহ কখন করা জরুরি, প্রশ্নগুলো গুরুতর। পোশাকের রাজনীতির ইতিহাস অন্তত আমাদের এইটুকু শেখাতে পারে যে, নিজের দেহকে কোন পোশাকে সাজিয়ে একজন নারী প্রকাশ্যে আসবে সেটা তার উপরে ছেড়ে দেওয়াই গণতান্ত্রিক নীতি।

চিররঞ্জন সরকার লেখক ও কলামিস্ট। অ্যাডভোকেসি অ্যানালিস্ট, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেইঞ্জ, ব্র্যাক। chiros234@gmail.com